রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অতিথি' : দর্পণে তারাপদ চরিত্র

গীতিকা দাস

রবীন্দ্রনাথের "অতিথি" গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরী তাঁর "বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার" গ্রন্থে যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"অতিথি রবীন্দ্র ছোটগল্পে পল্লীবাংলার জীবনমন্থিত অন্তিম নির্যাস"। 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ গল্প 'অতিথি'। গল্পটি ওই পত্রিকার ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি রবীন্দ্র প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃষ্টি। একটি মনুষ্য চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতির বিশিষ্ট স্বরূপ ও রহস্যকে রূপায়িত করে কাব্যানুভূতি ও জীবন সমীক্ষার মণিকাঞ্চন যোগ দেখা যায় এই গল্পটিতে। এই গল্পের নায়ক তারাপদ হচ্ছে প্রকৃতির সন্তান। উদাসীন নিরাসক্ত প্রকৃতির-ই প্রতীক এই চরিত্র। চিরবন্ধন অসহিষ্ণু প্রকৃতির আনন্দিত সত্তা সে।

গল্পগুচ্ছের অন্যান্য গল্পের মতো এ গল্পের বাস্তব পটভূমি পদ্মাতীরবর্তী প্রকৃতি ও মানুষের জগৎ। প্রকৃতির উদার অম্লান মহিমার এক একটি রূপ রবীন্দ্রনাথের অন্তরে সেদিন যে অনুভবের জন্ম দিয়েছিল তা ধরা রয়েছে "ছিন্নপত্রে"। রবীন্দ্রকল্পনায় এক নিত্যকালের চিরপথিকের দেখা বার বার মেলে যার চলমানতার সঙ্গে মিশে গেছে গতিময় পৃথিবীর সচল ছন্দ। "ছিন্নপত্র" রচনাকালেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন "সোনারতরী" কাব্য যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির পরিচয় তাঁর মনকে খুব কাছ থেকে জাগিয়ে রেখেছে। সেই একই সময় রচিত হয়েছিল রবীন্দ্র প্রতিভার অসামান্য সৃষ্টি হীরকদ্যুতিপ্রভ তাঁর ছোটগল্পগুলো যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি অনন্ত অনুভব বন্ধনে ধরা পড়েছে।

পদ্মার উপর বোটে ভাসমান কবি প্রকৃতিকে দেখেছেন নিবিড়ভাবে, অনুভব করেছেন তার সচল ছন্দ, তার মর্ত্যমমতা আবার অসক্তিহীনতা। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, এই পৃথিবীর মুখে ভারী একটা সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে। পৃথিবী সৃষ্টি করে, জন্ম দেয়—কিন্তু ধরে রাখতে পারে না। তারপদ যেন সেই পৃথিবীর কোলে জন্ম নেওয়া এক চিরপথিক, যে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে বারবার

পালিয়ে যায়। "ছেলেবেলা", "জীবনস্মৃতিতে" যে বালককে জানালার ফাঁক দিয়ে প্রকৃতিকে দেখার আকুলতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে, সেই বালকই পরিণত বয়সে বাংলাদেশের উদার প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তায় মগ্ন হয়ে এই গল্প লিখেছেন। যেন "রবীন্দ্রনাথের অন্তরের ঘর ছাড়া নিরুদ্দেশ স্নেহবন্ধনবিমুখ কবিসত্তা তারাপদের মধ্যে রূপলাভ করেছে।"

'অতিথি' ছোটগল্পের কিশোর নায়ক তারাপদ যেন এই পৃথিবীর পান্থনিবাসে ক্ষণিকের অতিথি। উক্ত গল্পটির বিষয়বস্তু তথা গল্পটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বে গল্পটির নামকরণ কতটা সার্থক তথা যথাযথ হয়েছে তা জেনে নিতে হবে।

তর্কশাস্ত্র বলে বিশিষ্ট নাম লক্ষণার্থক নয়। সাহিত্যে কিন্তু বিশিষ্ট নাম লক্ষণার্থক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ তা যদি গ্রন্থের নাম হয়। তাই সাহিত্য শাস্ত্রীরা উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কাব্য ইত্যাদির নামকরণের সার্থকতা বিচারের কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন। সেই শর্তগুলির যে কোন একটিকে পূরণ করলেই কোন রচনার নামকরণ শিল্পসম্মত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

কিন্তু 'অতিথি' ছোটগল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্য শাস্ত্রীদের নির্ধারিত শর্তগুলোর প্রায় কোনটিকেই রবীন্দ্রনাথ উক্ত ছোটগল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রহণ করেননি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য কর্মের নামকরণ ব্যাপারে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অতিশয় সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি রচনাই তাৎপর্যমণ্ডিত এবং ব্যঞ্জনাময় নামের অধিকারী। এখন লক্ষণীয় যে, আলোচ্য গল্পের নায়ক তারাপদ, শিশু নায়িকা চারুশশী কিন্তু তাদের নামানুসারে গল্পের নামকরণ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য ছোটগল্পের নাম রেখেছেন "অতিথি"। আলোচ্য গল্পে উক্ত "অতিথি" শব্দটিকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। এই গল্পে উক্ত শব্দটির এক বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।

'অতিথি' শব্দের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যিনি অকস্মাৎ গৃহস্থ গৃহে আশ্রয়ার্থে এসে উপস্থিত হন কিন্তু স্থায়ীভাবে থাকেন না এবং যার নাম, গোত্র অবিদিত এইরূপ ব্যক্তিই অতিথি। আবার বৌদ্ধ শাস্ত্রানুযায়ী বিদ্বান, হিতোপদেশ দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গলকারী, ভ্রমণকারী পথিকের নাম অতিথি। তার যাতায়াতের কোন নির্ধারিত তিথি থাকে না। অতিথি শব্দের এই শাব্দিক ব্যাখ্যা আমরা তারাপদের মধ্যে দেখতে পাই।

কাহিনির মধ্যে তার আগমন, গমনের কোন নির্দিষ্ট তিথি দুর্লক্ষ্য। কখন যে সে ধুমকেতুর মতো কোথায় উপস্থিত হয় তার খবর বোধহয় সে নিজেও জানেনা।

তাছাড়া অতিথি শব্দের অভিধানিক অর্থ হল ন তিথি যাহার। অর্থাৎ যে কোন দিনক্ষণ তিথি দেখে আগমন করে না। অর্থাৎ যে কোন গৃহে হঠাৎ আগমন করে, এবং কিছুদিন সেখানে থেকে সে স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। এইরূপ ব্যক্তিই অতিথি। তারাপদের চরিত্রেও আমরা উক্ত লক্ষণগুলো প্রত্যক্ষ করি। অতিথির ন্যায় সে-ও সর্বস্থানে গিয়েছে ক্ষণিকের জন্য এবং সেখান থেকে চলে এসেছে আপন বৈশিষ্ট্যের তাড়নায়। সে কেবল মতিলাল বাবুর সংসারের অতিথি স্বরূপ নয়। কারণ সে কেবল মতিলাল বাবুর পরিবারেই হঠাৎ আগমন করেনি, এমনকি যাত্রাদলে, পাঁচালির দলে, জিমন্যাস্টিকের দলেও তার আগমন ঘটেছে আকস্মিকভাবে এবং সেখানেও সে বেশীকাল স্থায়ীভাবে আবদ্ধ না থেকে বন্ধনহীন পাখির মত অজানা অনির্দেশের অভিযানে যাত্রা করেছে। তারাপদ তার সমস্ত জীবনকালে একই জায়গায় কখনও স্থায়ী হয়নি। সকল স্থানে, সকল সময়েই সে যথার্থ অতিথির ভূমিকা পালন করেছে।

সুতরাং এই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে আমরা মন্তব্য করতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের "অতিথি" গল্পের নামকরণ যথার্থই যুক্তিযুক্ত ও সার্থক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গল্পের নামকরণের ব্যাপারে সূক্ষ্ম কারুকৃতিত্বের পরিচয় জ্ঞাপন করে যথার্থই সার্থকতার দ্বার উন্মোচন করেছেন।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে "অতিথি" গল্পের বিষয়বস্তু ও কিশোর নায়ক তারাপদের স্বভাব ও প্রকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রকৃতি নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমি হিসেবে কেবলমাত্র উপস্থিত হয়নি—সাধারণ নিসর্গ বর্ণনার মধ্যেই তা সীমিত নয়। একটি উপলব্ধির সজীব সত্তার স্তরে অবিচ্ছিন্ন আত্মিকতা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিমূলক ছোটগল্পে প্রকৃতি নিজেই একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। মানব মনের সঙ্গে প্রকৃতির যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে, প্রকৃতির জড় সত্তার অস্তিত্বহীন মানবিক রূপ রয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে মানব জীবন—রবীন্দ্রনাথের এই গভীর বিশ্বাস তাঁর রচিত 'অতিথি', 'পোস্টমাস্টার', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'সুভা', 'আপদ', 'ঘাটের কথা' প্রভৃতি ছোটগল্পে অনুপম সৌন্দর্যে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'অতিথি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ মানব মনের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সিংহ দ্বারটি খুলে দিয়েছেন। তারাপদের তুচ্ছ সামান্য কাহিনিও প্রকৃতির সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র খচিত চন্দ্রাতাপের তলে, তার আভাস ইঙ্গিত বিজড়িত রহস্যময় আকাশ বাতাসের

মধ্যে এক অপরূপ গৌরব লাভ করেছে। প্রকৃতিপ্রাণ সদা সঞ্চরণশীল, প্রবহমান, চিরচঞ্চল, মুক্ত, উদার, সর্বব্যাপী সাবলীল—ভালবাসায় কিন্তু মানুষের অবিশ্রান্ত গতিশীলতা নেই, তাই ভালবাসার মধ্যে আছে মোহ, সঙ্কীর্ণ আসক্তি, নিজের ছোট্টমনের চারদিকে স্নেহের বেষ্টনের মধ্যে এক গাঢ়তর মোহাবেশ আছে। তারাপদর স্নেহবন্ধনে ধরিত্রী মাতার সেই উদার অনাসক্ত ভাব, সাবলীলতা ও গতিশীলতা রয়েছে। আসলে তারাপদ প্রকৃতির এই উদার অনাসক্তি, মোহমুক্তিরূপ চিরচঞ্চলতার মনুষ্য প্রতিরূপ। অতিথি গল্পের তারাপদ রবীন্দ্র কবিচেতনার প্রকৃতি তন্ময়তার মূর্ত প্রতীক। প্রাণকে প্রকৃতির গভীরে ডুবিয়ে চোখেদেখা জীবনের প্রচ্ছদে কবিই এই গল্পে তারাপদ চরিত্রকে এঁকেছেন।

তারাপদের স্বভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তারাপদ হরিণ শিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সঙ্গীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগি করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনো সংগীত সভায় সে যেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্কভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃংখল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চিৎকারধ্বনি সকলই তাহাকে উতলা করিত। এই সংগীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালির দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল, দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে বক্ষপিঞ্জরের পাখির মতো প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া গেল।"

কোন নিয়মের বাঁধনে সে ধরা দেয়নি। সে এ সংসারে পঙ্কিল জনের উপর শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মত সাঁতার দিয়ে বেড়াত। কৌতূহলবশত যতবারই ডুব দিত তার পাখা সিক্ত বা মলিন হত না। এজন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র-স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লান ভাবে প্রকাশিত হত। একবার যাত্রার দলে, একবার জিম্‌ন্যাস্টিকের দলে, একবার নৌকারোহী দোকানীর সঙ্গে, আবার কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল বাবুর সঙ্গে তারাপদ ঘুরে বেড়ায়। সকল ব্যাপারেই তার পটুত্ব

আছে, কোন ব্যাপারেই তার আগ্রহের অভাব নেই, অথচ কিছুতেই তার আসক্তি নেই।

প্রকৃতির সঙ্গে তারাপদর ঘনিষ্টতা যে কতটা সুনিবিড়, তা এই গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। এই ঘনিষ্টতার বর্ণনায় সস্নেহতার সুর লক্ষ্য করা যায়—"তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে; এইজন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথবা সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষ মাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে, কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ—ভূত—ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই—তাহার একমাত্র কার্য।"

গল্প মধ্যে নায়ক তারাপদর যে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাতে স্বাভাবিক মানবিকতা কোথাও কুণ্ঠিত হয়নি। তারাপদ তার বালকোচিত কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসার বশবর্তী হয়ে অনন্ত প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে। সেখানেই সে পেয়েছে মনের আশ্রয়। সংসার একটা উপলক্ষ তার কাছে। গল্পটিতে বালক বয়সের একটি নিবিড় ভাবরস আছে। কারো কারো মধ্যে সেই ভাবরসের প্রাবল্য অনেক বেশি। সেই ভাবরসের কৌতূহল তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, তাকে বাউলের মতো ঘুরিয়ে বেড়ায়। তারাপদ এমনই এক বালক। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা বালকমন সর্বদা সজাগ ছিল, ছিল একটা বাউল মনও। তাঁর এই দুই মনেরই মহোত্তর প্রকাশ ঘটেছে তারাপদ চরিত্রে।

তারাপদ গৌরবর্ণ, সুন্দর। তার সুললিত সৌকুমার্য চোখ তার হাস্যময় ওষ্ঠাধরে প্রকাশিত। তাকে দেখে কোনো শিল্পীর সযত্ন রচিত বলে মনে হয়। তার ব্রাহ্মণশ্রী এমন, ধারণা হয় "যেন সে পূর্বজন্মে তাপস বালক ছিল।" তারাপদর চেহারার মতো স্বভাবটিও মিষ্ট এবং আকর্ষণীয়, মুহূর্তে জনচিত্ত জয় করতে দক্ষ সে। যারাই তারাপদের কাছাকাছি আসে তারাই মুহূর্তের মধ্যে তারাপদকে ভালোবেসে ফেলে এবং তাকে সাংসারিক বন্ধনে বাঁধতে চায়। কিন্তু ভীরু হরিণ শিশুর মতোই সে সকল বন্ধন ছিন্ন করে নিজের পথে উধাও হয়ে যায়। আসলে তারাপদর মধ্যে আছে এক আসক্তিহীনতা। প্রকৃতির মতোই মুক্ত তার প্রকৃতি। কোন বন্ধনেই সে জড়িয়ে পড়ে না। সে যেন আকাশের মুক্ত বিহঙ্গ, হঠাৎ মর্ত্যসঙ্গীতের আকর্ষণে দুর নীলাকাশ থেকে নেমে আসে কোনখানে, বাঁধা পড়ে কোন স্নেহপিঞ্জরে, কিন্তু যখনই সে বন্ধন হয়ে ওঠে তার কাছে নিগড়—আসক্তির খাঁচা কেটে সে বেরিয়ে পড়ে সুদুর

নীলাম্বরে। প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্য এবং প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় আন্তরিক বন্ধনের কথা তারাপদ চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

আলোচ্য গল্পে দেখা যায়, কাঁঠালিয়ার জমিদারবাবু এবং তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণাদেবী প্রথম পরিচয়েই তারাপদকে ভালোবেসে ফেলেন। যখন তাঁরা জানতে পারেন যে সাত-আট বছর বয়সেই স্বেচ্ছায় এই বালক ঘর ছাড়া হয়েছে এবং নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন বাৎসল্য প্রেমে তাঁরা তারাপদকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এবং সন্তানের মতোই তাকে লালন-পালন করেন। তারাপদ কোনোদিনই স্নেহের বন্ধনে বন্দী গৃহবাসী হতে চায়নি। নিজগৃহের ও প্রতিবেশীর অপরিসীম স্নেহ-ভালবাসা সত্ত্বেও গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে। "তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে।" বাইরের পৃথিবীর স্বাধীনতা তাকে আহ্বান জানিয়েছে। তাই বিভিন্ন দলে বিভিন্ন সময়ে থেকেও এবং স্নেহ ও স্বীকৃতি পেয়েও তার নির্লিপ্ত ও মুক্ত মনের কিছুমাত্র পরিবর্তন আসেনি। মতিবাবু ও অন্নপূর্ণার পরিবারের আশ্রয় সাময়িকভাবে তারাপদ স্বীকার করে নিয়েছিল। মতিবাবুর গ্রাম কাঁঠালিয়ার সাধারণ মানুষের মনও সে অবলীলাক্রমে তার সহজ স্বাভাবিক আন্তরিকতা দিয়ে জয় করে। এমনকি প্রথমাবস্থায় তারাপদর প্রতি বিরূপ চারুকেও সে তার প্রতি আকর্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল। মতিবাবুদের আশ্রয়ে থাকতেই তারাপদর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হলো। চারুর সংস্পর্শে এলে "চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত।" এই আবদ্ধ ও আসক্তভাব তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হত। তারাপদর মনের এই ক্ষণিক আচ্ছন্নতা, অপরদিকে মতিবাবুদের চারু তারাপদর বিবাহ প্রচেষ্টা তারাপদকে হয়তো গৃহের গণ্ডিতে বন্দী করে ফেলত। কিন্তু এমন সময় বাইরের বন্ধনহীন মুক্ত জগৎ ও প্রকৃতির আহ্বান তার কাছে আবার এসে উপস্থিত হল। তারাপদর ঔদাত্ম্য প্রকৃতিলীনতা ক্ষুদ্র ঘরকন্নার জগৎ থেকে বৃহৎ পৃথিবীর বৈচিত্র্যময়তার মধ্যে তার প্রকৃত স্থান খুঁজে নিল।

তারাপদ প্রকৃতির সন্তান। তার জীবনের মূলমন্ত্র 'চরৈবেতি'-কোথাও চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে, স্থানু হয়ে থাকা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। অতি শৈশব কালেই তারাপদ অনুভব করেছিল যে, প্রকৃতির জীবনধারা সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যেদিয়ে নিরন্তর অগ্রসর হচ্ছে। প্রকৃতি নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত ও চিরচঞ্চল। নদীর জলস্রোতের মতো সে বন্ধনহীন ও চির অগ্রসরমান। ছেলেবেলা থেকে তারাপদ কোন বন্ধনেই আবদ্ধ হয়নি। স্নেহ মমতার বন্ধনও তার কাছে অসহ্য হয়েছে। বাইরের বিশ্বপ্রকৃতির বন্ধনহীন, মমতাহীন,

অবারিত স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তার চিত্ত লালায়িত হয়ে উঠত। তারাপদ বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রথমে যাত্রার দলে, তারপর পাঁচালির দলে, শেষে জিমন্যাস্টিকের দলে যোগ দিয়েছে। সেবার যখন সে বাবুদের শখের যাত্রাদলে যোগ দিতে যাচ্ছিল তখনই নন্দী গ্রামের পথে মতিলালবাবুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে। যখন সে যাত্রার দলে ছিল, সেই দলের অধিকারী তাকে সন্তানের মত স্নেহ করত। যাত্রাদলের ছোটো-বড়ো সকলে এমনকি যে বাড়িতে যাত্রা হত, সে বাড়ির লোক জনেরাও তাকে স্নেহ করত। কিন্তু যখনই স্নেহ প্রীতি মমতার স্থায়ী বন্ধনে তাকে বেঁধে ফেলার পরিকল্পনাটি সে টের পেল, তখনই তারাপদর মনেজেগে উঠল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ফলে যাত্রাদল ছেড়ে সে পালিয়ে গেল। শেষবারে সে জিমন্যাস্টিকের দলে জুটেছিল। তারাপদ নিজের চেষ্টায় ভালো বাঁশি বাজাতে শিখেছিল, জিমন্যাস্টিকের সময় সে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সুরে বাঁশি বাজাতো। সেই দল ছেড়েও একসময় তারাপদ পালিয়ে আসে সমস্ত স্নেহ বন্ধনকে অগ্রাহ্য করে।

তারাপদ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের সঙ্গে কাটিয়েছে কিন্তু সেখানকার পঙ্কিল আবহাওয়া তাকে সামান্যও স্পর্শ করতে পারেনি। সে ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও মুক্ত। সংসারে অনেক কুৎসিত কথা সে সর্বদা শুনেছে এবং অনেক কদর্য দৃশ্য তার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, কিন্তু সেসব তার মনকে তিলমাত্রের জন্যও আকর্ষণ করতে পারেনি। "অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোনো প্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করতে পারেনি"। তারাপদর চরিত্র ভাবনার মধ্যে কবির একটি বিশিষ্ট চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। ১৩০১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত "বিহারীলাল" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়। আর একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখি আর একজন খাঁচার পাখি।" "অতিথি" গল্পের তারাপদ সেই 'বনের পাখি' এবং "আপদ" গল্পের নীলকান্ত 'খাঁচার পাখি'। বনের পাখি সমস্ত বন্ধনকে অগ্রাহ্য করে পরমানন্দে আকাশে পক্ষবিস্তার করবে সেই তো স্বাভাবিক।

তারাপদ কিন্তু তত্ত্ব হয়ে থাকেনি, বরং লেখক যেভাবে চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করেছেন তাতে তার মনুষ্যধর্মে প্রশ্ন জাগে না। ঘরছাড়া, পালিয়ে বেড়ানো, অকাজের রাজা, উদাসীন এই বালকটিকে লেখক তিরস্কার করেননি, এর প্রতি স্নেহ বর্ষণ করেছেন। একথা তো ঠিকই যে গাঁয়ের বাড়ি পালানো বাউণ্ডুলে ছেলেদের

মডেল থেকেই লেখক উপকরণ নিয়েছেন, তারপরে অভিনব এক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে তাকে পূর্ণাবয়ব দিয়েছেন। বালক সুলভ কৌতূহলে সে নতুন থেকে নতুনতরের আকর্ষণে ঘুরে বেড়িয়েছে। যাত্রার দল বা জিমন্যাস্টিকের দলের যাবতীয় কঠোরতা ও পঙ্কিলতাকে সে মুগ্ধ দৃষ্টিতেই দেখেছে। চারুদের বাড়িতে তার দু-বছরের ঘটনাবলী বিশেষ করে চারুর ঈর্ষা কলহ এবং অবশেষে প্রেম তাকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে। কখনো কখনো সে সাধারণ বালকের মতো এতে অস্থিরতাও অনুভব করেছে, কিন্তু বিচলিত হয়নি। চারুর সাহচর্যে একসময় তারাপদের বয়ঃসন্ধিভেদী পুরুষত্ব উন্মেষের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে দু বছর ধরে যা গড়ে উঠেছিল, একদিন বর্ষায় তা ভেসে গেল।

গল্পের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তারাপদ ঘাটে গিয়ে দেখল, জলের স্রোত আর মানুষের চলার উৎসব। এই গতির দৃশ্য ধ্বনিমগ্ন হয়ে উঠল তার স্নায়ুতে, তার অস্তিত্বের মর্মমূলে। ক্ষণকালের মায়া বন্ধনকে কেড়ে ফেলে তারাপদ আবার বেড়িয়ে পড়ল নিরুদ্দেশের যাত্রায়। কাঁঠালিয়ার মতিলাল বাবু বা নিজের আত্মীয় বন্ধু কারো স্নেহের দাম তারাপদ দিল না, পুনর্বার সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তার নিরুদ্দেশের বর্ণনাটি কি মমতাপূর্ণ, "স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্র বন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণ বালক আসক্তি বিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব পৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।"

কারণ তারাপদ প্রকৃতি মাতার স্তন্যে লালিত। প্রকৃতির অবারিত সহজ প্রাণের অধিকারী সাংসারিক তুচ্ছ স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করে উদাস অনাসক্ত প্রকৃতি মাতার বক্ষে লুকিয়ে গেছে—তার একমাত্র কারণ তারাপদ প্রকৃতির আত্মার আত্মীয়, প্রকৃতির জাতক। তাই সে শুনতে পায় সুদূরের ডাক, প্রকৃতির হাতছানি।

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি
মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই
সে কথা যে যাই পাসরি।"

তারাপদ সেই ব্যাকুল বাঁশরি শুনেই ঘর ছেড়ে ছুটে চলে—গৃহ থেকে গৃহান্তরে, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। এই চিরচঞ্চল পথিক নতুন অতিথিশালার খোঁজে চলে আবার হারিয়ে যায় আবার নতুন পথে চলে নতুন পথিক। নিখিল বিশ্ব তার আবাস—প্রকৃতি তার অনন্ত পথ।

তার দুচোখে অপার কৌতূহল, কণ্ঠে সুর—"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের-পিয়াসী।" ছোটগল্পকার ও সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে—"রবীন্দ্রকল্পনায় এক নিত্যকালের বালকবীর আছে যে চিরযাত্রিক।" এই চিরপথিকের প্রকৃতির পান্থনিবাসে চিরন্তন ভেসে চলাই "অতিথি" গল্পে তারাপদর চরিত্রে মূর্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প গুলি শুধুমাত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যেরই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই এক উজ্জ্বল সৃষ্টি। শান্ত, সহজ, বাস্তবিক এবং একই সঙ্গে অভিনব চরিত্র ধর্মের অধিকারী তারাপদ চরিত্রটি আপন বৈশিষ্ট্যে শাশ্বত হয়ে রয়েছে বাংলা সাহিত্যে।